ওয়েস্টার্ন উপন্যাস

ওসমান সিরিজ

স্বর্ণতৃষ্ণা কুহকিনী

রওশন জামিল

বেঙ্গলবুকস

প্র কা শ ক
মাহমুদুল হাসান
বেঙ্গলবুকস

নোভা টাওয়ার, ২/১ নয়া পল্টন, ঢাকা ১০০০
বিশাল বুক কমপ্লেক্স, ৩৭ নর্থব্রুক হল রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
ফোন : +88 01958519882, +88 01958519883
পরিবেশক : কিন্ডারবুকস, বেঙ্গলবুকস

বইটির কোনও অংশ বা সম্পূর্ণ বই কম্পোজ বা ফটোকপি আকারে বিক্রয় বা সরবরাহ অবৈধ। এ বইয়ের কোনও লেখা বা চিত্র হুবহু, পরিমার্জন বা পরিবর্ধন করে ছাপানো এমনকি কোনও ইলেক্ট্রনিক যন্ত্রের মাধ্যমে সংরক্ষণ করা কপিরাইট আইন, ২০২৩ অনুযায়ী দণ্ডনীয়।

ISBN : 978-984-683-012-5

www.bengalbooks.com.bd
email : info@bengalbooks.com.bd

বে ওয়েস্টার্ন
একটি বেঙ্গলবুকস
সিরিজ প্রকাশনা

বেঙ্গলবুকস প্রথম প্রকাশ : শ্রাবণ ১৪৩২, জুলাই ২০২৫
কপিরাইট © প্রকাশক
প্রচ্ছদ : আজহার ফরহাদ
বর্ণবিন্যাস ও কম্পিউটার গ্রাফিক্স : ক্রিয়েটিভ ডিজাইন অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট
মুদ্রণ : প্রিন্ট ওয়ার্কস, ২৯ মিরপাড়া, আমুলিয়া রোড, ডেমরা, ঢাকা ১৩৬০
অনলাইন ডিস্ট্রিবিউটর : রকমারি ডট কম, বাতিঘর ডট কম
ভারতে পরিবেশক : ধ্যানবিন্দু, কলেজ স্ট্রিট, কলকাতা
যুক্তরাজ্য পরিবেশক : সঙ্গীতা লিমিটেড, ২২ ব্রিকলেন, লন্ডন
যুক্তরাষ্ট্র পরিবেশক : মুক্তধারা, জ্যাকসন হাইটস, নিউইয়র্ক

মূল্য : ২৮০ টাকা

Swarnatrisha & Kuhokini by Raoshan Jamil
First published in paperback in Bangladesh by BengalBooks in 2025
Text and Illustrations Copyright reserved by the Publisher

Printed and bound in Bangladesh

স্বর্ণতৃষা

এক

এমন নয় যে লোকটাকে সাবধান করা হয়নি; হয়েছিল এবং তাতে সন্দেহের অবকাশ ছিল না কোনো।

'মিস্টার,' ওকে বলেছিলাম, 'চুরি করতে গিয়ে নিজের বিপদ ডেকে আনছ কেন?'

কিন্তু সংসারে এমন বেয়াড়া ধরনের কিছু লোক থাকে, একটা ভুলে তাদের শিক্ষা হয় না, দুটো করা চাই। ওয়েস বিগলো সেই জাতের লোক। ফলে যা হবার তাই হলো, শহরের পশ্চিমে একটা গোরস্থান আছে, সেখানে ওকে কবর দিল ওরা। এই শহরে যারা গানফাইটে নিহত হয়, তাদের ওখানেই কবর দেওয়ার রেওয়াজ।

আর ওই এক ঘটনাতেই আমার নাম লোকের মুখে মুখে ছড়িয়ে পড়ল। মন্দ লোক হিসেবে ওরিন ওসমানকে এখন উভালদে শহরের সবাই চেনে। মন্দ লোক—অর্থাৎ, যাদের সঙ্গে ঝামেলায় জড়ালে বিপদ হয়। ন্যায়ের পক্ষ নেওয়ায় অমন অনেক ভাল ভাল লোক 'মন্দ' বলে পরিচিত। তবে ওই

খেতাবের জন্যে আমি একটুও লালায়িত ছিলাম না, তাই ঠিক করলাম চলে যাব উভালদে ছেড়ে।

আসলে বিগলো ছিল গোঁয়ার। আমার লিকলিকে স্বাস্থ্য দেখে ভেবেছিল তুড়ি মেরে উড়িয়ে দেবে। কিন্তু ও কীভাবে জানবে, অস্ত্র চালনায় আমার হাতেখড়ি শৈশবে। আমাদের বংশে এটাই রীতি; শরীরে এর ভার সইবার শক্তিটুকু হলেই রাইফেল দেওয়া হয়। আমার জীবনের পয়লা শিকার একটা কুগার। আমার বয়েস তখন পুরো ন'বছরও পোরেনি। কুগারটা আমাদের শুয়োরের খোঁয়াড়ে হানা দিয়েছিল। তেরোতে মারি একজন হিগিনসকে। বাবার দিকে সে রাইফেল তাক করেছিল। হিগিনসদের সাথে আমাদের তখন ঘোর লড়াই চলছে।

আমরা মোট পাঁচ ভাই। আমি-ই সবার বড়। এরপর অ্যানজেল, ও'নীল, জো এবং সবার ছোট বব। ছেলেবেলায় আমাদের যত আবদার, সব ছিল বাবার কাছে। সব ধরনের অস্ত্র চালনা শিখিয়েছেন তিনি। তাঁর কাছেই কর্নিশ-স্টাইল কুস্তি শিখেছি। বাবা এক-আধটু মুষ্ঠিযুদ্ধ জানতেন, তাও তালিম দিয়েছিলেন আমাদের। এত যে আবদার, তবু সময়ে সময়ে ভীষণ কঠোর হতেন বাবা। গোলাবারুদের অপচয় একদম পছন্দ করতেন না। শিকারে গিয়ে কোনো গুলি ফসকালে আর রক্ষে ছিল না, কৈফিয়ত দিতে হত—কেন ফসকাল।

অস্ত্র নিয়ে তামাশা সইতে পারতেন না তিনি। যদি কখনও দেখতেন, আমরা কোনো অস্ত্র নিয়ে খেলা করছি, শরীরের হাড়মাংস সব এক জায়গায় করতেন। তবে আমাদের কারও

কপালেই তেমন দুর্ভোগ হয়নি। বাবা বলতেন, 'অস্ত্র খেলার জিনিস নয়। তুই একে সম্মান করলে এও রক্ষা করবে তোকে। কোনো কারণ ছাড়া কক্ষনো হাত দিবি না অস্ত্রে।'

আমি বরাবর একলাটি। নতুন নতুন জায়গা দেখতে আমার ভাল লাগে। কৈশোরে ন্যাটশেস ট্রেস ধরে চলে গিয়েছিলাম নিউ অরলিন্সে। এর কিছুদিন পর শুরু হয় গৃহযুদ্ধ। আমি তাতে যোগ দিই।

ইউনিয়ন আর্মির হয়ে আমাকে লড়াই করতে দেখে ভীষণ অবাক হয়েছিলেন জেনারেল গ্র্যান্ট। হবারই কথা। আমার বাড়ি টেনেসি। কনফেডারেটদের পক্ষে ওই রাজ্যটিও যোগ দিয়েছিল। অন্য রাজ্যগুলো—অ্যালাবামা, আরকান'স, ফ্লোরিডা, জর্জিয়া, লুইসিয়ানা, মিসিসিপি, নর্থ ক্যারোলাইনা, সাউথ ক্যারোলাইনা, টেক্সাস আর ভার্জিনিয়া।

জেনারেলকে কী জবাব দিয়েছিলাম, আমার তা আজও মনে আছে—'এই দেশ গড়তে গিয়ে আমার বাপ-দাদারা জান পানি করেছেন। আমি সেটা নষ্ট হতে দিতে পারি না, জেনারেল।'

কথাটা এখনও সমান সত্য। দেশের ডাকে ওসমান পরিবারের প্রতিটা লোক লড়বে। প্রয়োজনে মরতেও কুণ্ঠিত হবে না। আমরা এমনিতে নিরীহ, কিন্তু কেউ সেধে লাগতে এলে পিছিয়ে যাই না।

উভালদের বাইরে এক কাউ আউটফিটে যোগ দিলাম আমি। টেক্সাসের উত্তর থেকে গরুর পাল নিয়ে যাত্রা করলাম মন্টানার চারণভূমির দিকে। আমরা যাচ্ছি বোযম্যান ট্রেইল ধরে, প্রতি পদে শঙ্কার হাতছানি।

বিপদকে জয় করে আমি আনন্দ পাই। তবু এই ভবঘুরে জীবন আর ভাল লাগছিল না, মাথা গুঁজবার মত ঠাঁই খুঁজছিলাম একটা। কাউ আউটফিটে যোগ দেবার পেছনে এটাও একটা কারণ : এখান থেকে যে আয় হবে, ইচ্ছে আছে তা দিয়ে একটা কিছু গড়ব নিজের জন্যে।

ক্রেসি উওম্যান পর্বতের উত্তরে তিনজন লোক এল আমাদের ক্যাম্পে গরু কিনতে। বস বেচতে রাজি হলেন না, তবু রয়ে গেল ওরা। আমার নাম শুনে একজন কাছে এল।

'বিগলোকে তুমি মেরেছ?'

'হ্যাঁ।'

'ওর দু'ভাই বদলা নিতে এসেছে। মন্টানায় আছে,' পরামর্শ দিল সে, 'তুমি যেয়ো না।'

'আমি কারও সঙ্গে লাগতে চাই না,' বললাম, 'তবে বাধ্য করলে—'

'আচ্ছা, মোরার পিস্তলবাজ ও'নীল ওসমান তোমার কেউ হয়?' জিজ্ঞেস করল আরেকজন।

'ভাই। ও'নীল পিস্তলবাজ? কই, জানতাম না তো!'

'তাহলে আর বলছি কী,' জবাব দিল প্রশ্নকর্তা। 'ওখানে ওর দারুণ দাপট, সব খুনে-বদমাশ তল্লাট ছেড়ে ভেগেছে।'
'হ্যাঁ, পিস্তলে অবশ্যি নীলের হাত বরাবরই পাকা, দু-একবার আমাকেও হারিয়েছে।'

গ্যালাটিন উপত্যকায় পৌঁছে আমরা মন্টানার ঘেসো জমিতে গরু ছেড়ে দিলাম। আমাদের মালিকের নাম নেলসন ফস্টার।

শহর থেকে ডাক নিয়ে ফিরলেন তিনি। ওতে আমারও একটা চিঠি ছিল, জীবনে ওই প্রথম পেলাম।

যুদ্ধের সময় দেখতাম লোকে চিঠি পাচ্ছে, লিখছে। আমার কাছে কখনও আসত না বলে ব্যথা বাজত বুকে। তাই যখন ডাকের তলব পড়ত, বাবুর্চির সঙ্গে গিয়ে গল্প জুড়তাম। তিনকূলে কেউ ছিল না লোকটার, টেক্সাসের অদূরে এক কিওয়া ওঅর পার্টির হাতে নিহত হয়েছিল।

ওই চিঠিটা পেয়ে আমার সব কষ্ট যেন নিমেষে দূর হয়ে গেল। খামের ভেতর থেকে পুরু কাগজ বেরোল একখানা। নাকের কাছে তুলে কাগজের গন্ধ শুঁকলাম। ভাঁজ খুলতেই আমার চোখ স্থির হয়ে গেল। জড়ানো হস্তাক্ষর। মনে মনে বিষম খেলাম, ছাপার অক্ষর যাও-বা পড়তে জানি, হাতের লেখা কিছুই বুঝি না।

একটু দূরে দাঁড়িয়েছিলেন মি. ফস্টার। আমার অসুবিধে বোধ হয় বুঝতে পারলেন তিনি। 'দাও, পড়ে দিচ্ছি,' বললেন।

রাজ্যের লজ্জা ঘিরে ধরল আমায়। এত বড় হয়েছি, সাতাশ-আটাশ বয়েস, অথচ পড়তে জানি না। ইন্ডিয়ান ওঅর ট্রেইল আমার চোখ সহজে চিনতে পারে, কিন্তু পড়াশোনায় বলতে গেলে একরকম আনাড়ি।

অ্যানজেল আর ও'নীল প্রত্যেকেই নিজের বাথান করেছে, চিঠি পড়ে মি. ফস্টার জানালেন। মা এখন মোরায়, নিউ মেক্সিকোতে। এক বনেদি স্প্যানিশ পরিবারে বিয়ে করেছে নীল। অ্যানজেল রাজনীতি করছে, সমাজে ওর যথেষ্ট প্রতিপত্তি।

আমার নিজের বলতে কী আছে? একটা জীর্ণ স্যাডল, চারটে পিস্তল, একটা উইনচেস্টার রাইফেল আর আমার পরনের এই কাপড়। হ্যাঁ, আরও একখানা জিনিস আছে বটে—আরকান'স টুথপিক। এক ধরনের ছুরি, হাতাহাতি থেকে মাংস কাটা—সবই চলে।

'তোমার ভাইয়েরা মনে হচ্ছে বেশ উন্নতি করেছে,' বসের কথায় আমার চমক ভাঙল। 'এখন তোমার লেখাপড়া শেখা উচিত, ওরিন। আমার বিশ্বাস, তুমি অনেক বড় হবে।'

ওই চিঠি পেয়ে বাড়ির জন্যে আমার প্রাণ কেঁদে উঠল। আমি ঘোড়া কিনতে বেরোলাম। এক ইন্ডিয়ানের সাথে দেখা হলো পথে। দুটো অ্যাপাসা ঘোড়া আছে ওর কাছে। আমার একটা ৩৬ ক্যালিবার পিস্তল পেলে ঘোড়াগুলো বেচে দেবে। শুরু হলো দরদাম। আমরা, টেনেসির লোকেরা, সেই ছেলেবয়েস থেকে ঘোড়া বেচাকেনা করে আসছি। একজন রেড ইন্ডিয়ানের সাধ্য কী আমাকে ঠকায়।

দীর্ঘ একহারা গড়ন লোকটার। বিষাদভরা চেহারা। কিন্তু সবচেয়ে আকর্ষণীয় ওর শিকারি কুকুরের মত একজোড়া চোখ। মর্মভেদী দৃষ্টি, মনে হয় যেন অন্তঃস্থল অবধি দেখে নিচ্ছে। ওই চোখই বলে দেয়—এ লোক, আর যাই হোক, কাউকে ঠকাবে না। ওকে মনে ধরল আমার, ইচ্ছে হলো সঙ্গে যা কিছু আছে বিলিয়ে দিই।

খেতে বসলাম ওকে নিয়ে। নানান কথা হলো আমাদের; পথ-ঘাটের অবস্থা, ইন্ডিয়ান সমাজের দুর্গতি-আকাল; কিন্তু

ভুলেও বিক্রির প্রসঙ্গ তুললাম না। মা বলতেন, ‘খাওয়ার সময় কারও মনে আঘাত দিবি না, গৃহস্থের অকল্যাণ হয়।’

সন্দেহ নেই, বেচারা বিপাকে পড়েই অমন সুন্দর ঘোড়া দুটো বেচতে চাইছে। ওরকম জিনিস হাতছাড়া হলে কার না মন খারাপ হয়। আহার শেষে আপসরফায় এলাম আমরা। একটা পিস্তল, দশটা কার্তুজ, একটা পুরোনো কম্বল আর এক বোতল হুইস্কির বিনিময়ে দুটো অ্যাপাসা কিনে নিলাম।

ইন্ডিয়ানের চাহিদা ছিল মাত্র একটা পিস্তল, এত কিছু দেবার পরও আমার মনে হলো জিত আমারই হয়েছে।

এরপর আমি বাড়ির পথ ধরলাম। মাকে একটিবার দেখবার জন্যে আনচান করছে মন। এই পশ্চিমে, মেয়েছেলের ধূমপান অনেকেই পছন্দ করে না। তবু মায়ের মুখের সেই পুরোনো পাইপ, তামাকের ঘ্রাণ—এসবের জন্যে হু-হু করে উঠছে আমার অন্তর। নড়বড়ে দোলনা চেয়ারটার ক্যাচক্যাচ আওয়াজ কত দিন শুনি না! বেড়ে ওঠার বয়েসে ওই শব্দ ছিল আমাদের কাছে পরম নির্ভরতার প্রতীক। বুঝতাম, বাড়িতে আছি।

মা যেন আমাদের শত হাতে আগলাতেন। তার ভাঁড়ার ছিল যেন সাক্ষাৎ প্রকৃতির ঝাঁপি। এত যে খরা-দুর্ভিক্ষ, খাওয়ার টেবিলে বসলে সেটা বোঝার উপায় ছিল না। কী এক অদ্ভুত কায়দায় মুখরোচক সব খাবার আমাদের সামনে তুলে ধরতেন মা।

নিউ মেক্সিকোর উদ্দেশে রওনা হলাম আমি। মন্টানা থেকে ঘোড়ার পিঠে নিউ মেক্সিকো বেশ দূরপথ। তাই বলে দমলাম

না। বাসায় সকলের সঙ্গে দেখা করে আবার বেরোব। সাতাশ প্লাস এমন কিছু বয়েস নয়, চেষ্টা করলে এখনও গড়তে পারব নিজের ভবিষ্যৎ।

শান্ত মনে যাচ্ছিলাম আমি, সোনা খোঁজা বা কোনো ঝঞ্ঝাটে জড়াবার অভিলাষ আমার একটুও ছিল না। আমি জানি, এরা জোড় বেঁধে থাকে। সোনা দুষ্প্রাপ্য বস্তু, কেউ পেলে সেটা নিজের কাছে রাখতে গিয়ে তাকে বহু ঝামেলা পোয়াতে হয়।

বুনো রুক্ষ ট্রেইলে এগোচ্ছি। চারিদিকে যোজনবিস্তৃত মরুভূমি, মাঝে মাঝে কাঁটা ঝোপ আর জংলা ঘাস। ইন্ডিয়ান ট্র্যাক চোখে পড়ছে, কিন্তু সুকৌশলে এড়িয়ে যাচ্ছি।

আর্মিতে থাকতেই আমার কানে এসেছিল, ভীষণ দুর্দিন যাচ্ছে ইন্ডিয়ানদের। ওদের কেউ কেউ, যেমন চেরোকীরা, ব্যবসায় নেমেও সুবিধে করতে পারছে না। তবে একটা বিষয়ে আমি নিশ্চিত, লড়াইয়ের সুযোগ কিংবা ঘোড়া চুরির মওকা পেলে ওরা আজও সেটা হাতছাড়া করবে না, দরকার হলে কয়েক ক্রোশ পথ অনায়াসে পাড়ি দেবে।

গৃহযুদ্ধের পরপর ডাকোটায় স্যু আর শাইয়েন গোত্রের বিরুদ্ধে লড়েছি আমি। এটা মিনেসোটায় লিটল ক্রো গণহত্যার পরের ঘটনা। তখন কয়েকবার ইন্ডিয়ানদের মোকাবিলা করেছিলাম। ওদের আমি সমীহ করি।

শম্বুক গতিতে এগোচ্ছি। ভোরের বাতাসে হিমের পরশ, পাহাড়ে তুষারপাতের আভাস দিচ্ছে। তবে দিনের বেলাটা মোটামুটি ওম জড়ানো। রাতে আকাশ চলে যায় নক্ষত্রের দখলে।

দুর্গম পাহাড়ি ট্রেইলে চলার আমেজই আলাদা। কদিনেই বেশ ঝরঝরে হয়ে উঠেছে আমার শরীর। রকি মাউন্টেনস পেরিয়ে, টিটন্স আর সাউথ পাসের দক্ষিণ হয়ে ব্রাউন্স হোলে পৌঁছুলাম।

দূর্বা-মোড়া ঢাল। চারপাশে অ্যাসপেনের সারি। ঝরনার ধারে ক্যাম্প করলাম আমি। ঘুণাক্ষরেও টের পেলাম না—সামনেই বিপদ।

দুই

পরদিন সকালে স্যাডলে চাপতেই ভৌতিক ট্রেইলটা চোখে পড়ল। অদূরে একটা লাল বেলেপাথরের দেওয়াল। তাতে অসংখ্য ফাটল। ওরই একটায় রুপোলি স্ফটিক বসানো।

বিপৎসংকুল এলাকায় যাদের চলাফেরা, সবসময় তারা সতর্ক থাকে। অস্বাভাবিক কিছু চোখে পড়লে সন্দিহান হয়ে ওঠে। নুয়ে পড়া ঘাস, ভাঙা ডাল, ঝরনার কাদা-ঘোলা পানি অনায়াসে তার নজরে আসে।

প্রকৃতির একটা সহজ স্বাভাবিক আটপৌরে ভঙ্গি আছে। জন্তু-জানোয়ার নিজেদের স্বচ্ছন্দে মানিয়ে নেয় এর সাথে। তারা

বাসা বানায়, কিন্তু আশপাশের পরিবেশ তাতে ক্ষতিগ্রস্ত হয় না। বীভার একমাত্র ব্যতিক্রম। তার বাসা জলে, সে গর্ত খুঁড়ে বাঁধ দেয়। এ ছাড়া অন্য কোনো বিশৃঙ্খলা দেখা গেলে ধরে নেওয়া চলে, ওটা কোনো মানুষের কাজ।

এই বিজন প্রান্তে স্ফটিকটা যে আপনাআপনি ওখানে উঠে যায়নি, তাতে আমার একটুও সন্দেহ নেই। নিশ্চয় বসিয়ে দিয়েছে কেউ। অথচ কাছেপিঠে লোকালয় তো দূরের কথা, গেল কদিনে একটা মানুষ চোখে পড়েনি আমার। সাউথ পাস সিটি বহুদূরে, ঘোড়ার পিঠে উত্তরে হপ্তাখানেকের পথ।

পাথরটা হাতে নিয়ে পরখ করে, আবার আগের জায়গায় রেখে দিলাম।

চারপাশে একটা গোল দাগ, অনেকদিন একভাবে থাকার ফল। এরকম পাথরের সাহায্যে পথের হদিস দেওয়া হয়, আমি জানি। ফিল্ড গ্লাস লাগালাম চোখে। বেশ খানিকটা দূরে আরেকটা স্ফটিক।

কৌতূহল চাপতে পারলাম না আর, স্ফটিক নির্দেশিত ট্রেইল ধরে এগিয়ে গেলাম। কাজটা যারই হোক, লোকটা বুদ্ধিমান। রাতের আঁধারেও এই ট্রেইল চেনা যাবে, সাদা স্ফটিকগুলোই বাতলে দেবে।

চড়াই বেয়ে ক্রমশ ওপরে উঠে এলাম আমি। আরেকটু গেলেই পাহাড়ের শেষ। বহুদূর অবধি দেখা যায় এখান থেকে। কোনো মানুষের ট্র্যাক বা পুরোনো ক্যাম্পফায়ারের চিহ্ন চোখে পড়ল না।

ঘুরে সংকীর্ণ একটা গিরিপথে ঢুকলাম। সন্ধে ঘনিয়ে এসেছে। গোধূলির লাল আভায় দাঁত বের করে হাসছে ক্যানিয়নের ন্যাড়া দেওয়াল। এখানে-সেখানে তুষার জমাট বেঁধে আছে।

প্রায় হাজার ফুট নিচে জঙ্গল। আসন্ন রাতের বাতাস হাড় কাঁপিয়ে দিচ্ছে। থমথমে পরিবেশ। অ্যাপাসার খুরের শব্দ আর জিনের মৃদু খসখসই কেবল একটুখানি আভাস দিচ্ছে প্রাণের। ধীর গতিতে এগোচ্ছে ঘোড়াটা, কান খাড়া।

সামনে, বাঁয়ে ছোট্ট একটা ডোবা। আধো অন্ধকারে রুপোলি জল ভৌতিক মায়া বিস্তার করেছে। ছোট ছোট ঢেউ জেগেছে হাওয়ায়। গা ছমছম করে উঠল আমার, পাহাড়চূড়ায় এই ধরনের ডোবায় অপদেবতারা বাস করে বলে শুনেছি।

ইচ্ছে করছে নিজের কপাল চাপড়াই, কোন দুঃখে এলাম এই পথে। এটা বোধ হয় প্রাচীন কোনো ট্রেইল হবে। আমার বাবা একবার ডোলোরেস নদীর ধারে কাটিয়েছিলেন কিছুকাল। সেটা এখান থেকে আরেকটু দক্ষিণে। ফাদার এসকালেনতে সান্তা ফে থেকে ক্যালিফোর্নিয়া যান মিশন খুলতে। তিনিও এ অঞ্চল পাড়ি দিয়েছিলেন, কিন্তু এত উচ্চতায় তাঁর আসবার প্রশ্নই ওঠে না।

নেহাত দায়ে ঠেকেছিল, নইলে এমন জনমানবহীন এলাকায় বেড়াতে আসে না কেউ। নিশ্চয় কোনো অমূল্য রত্নের খোঁজ পেয়েছিল লোকটা, সোনা-ই হবে সম্ভবত। এতটা এসে শেষ না দেখেই চলে যেতে সায় দিচ্ছে না আমার মন। আবার সেই

সঙ্গে ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় জানান দিচ্ছে, আর এগিও না।

সহসা ক্ষীণ শব্দে চমকে উঠল আমার ঘোড়া। নির্জন পথে চলতে গেলে ঘোড়ার ওপর আস্থা রাখতে হয়। মানুষের চেয়ে ওদের শ্রবণক্ষমতা প্রখর, সামান্যতম আওয়াজও কান এড়ায় না। তা ছাড়া এটা জাত অ্যাপাসা, দুর্গম অঞ্চল পাড়ি দিতে এর জুড়ি নেই।

বহুদূর থেকে ভেসে আসছে শব্দটা। নিবিড় বনে ঝড়ের শব্দের মতন। কাছে এগোতে আরও জোরালো হলো। বুঝতে পারলাম, ঝরনার জল গড়িয়ে পড়ছে।

আরেকটা গিরিপথে ঢুকলাম আমরা। এটা আগেরটার চেয়েও সরু। গিরিপথের একপাশে সেই ভূতুড়ে ডোবার পানি গড়িয়ে পড়ছে। জলকণায় আচ্ছন্ন পরিবেশ। একটা অস্পষ্ট ট্রেইল চলে গেছে ঝরনার ধার ঘেঁষে। ওই ট্রেইল যে অধিকাংশ সময় পানির তলায় থাকে, সেটা বুঝতে কল্পনাশক্তি লাগে না।

সাবধানে তাকালাম নিচের দিকে। জলপ্রপাতের গর্জনে কান পাতা দুষ্কর। ওই স্বল্প আলোতেও দেখলাম, দেওয়ালের গায়ে জ্বলজ্বল করছে একটা স্ফটিক। এবার আর কোনো ভ্রূকুটি মানল না মন, ধীরে ধীরে নামতে শুরু করলাম ঢাল বেয়ে। একবার পা হড়কালে রক্ষে নেই, সোজা হাজার ফুট নিচে কঠিন পাথরের ওপর গিয়ে পড়ব। পিছু হটার পথ বন্ধ, কোনো মাসটাংয়ের পক্ষেই তা সম্ভব নয়।

যত নিচে নামছি, ততই পানির ছিটায় ঝাপসা হয়ে আসছে চোখ। ট্রেইলটা প্রায় মাইল-তিনেক অনুসরণ করে একটা

উপত্যকায় নেমে এলাম আমি। গাছপালার ঘনত্ব দেখে বুঝলাম হাজার ফুট পাড়ি দিয়েছি। সেই ঝরনাটা আমার ডানে একটা সংকীর্ণ অথচ গভীর ক্যানিয়নে হারিয়ে গেছে। ক্যানিয়নের দেওয়াল আগাছা আর ফার্নে পরিপূর্ণ। তবে ট্রেইলটা বাঁক নিয়েছে উপত্যকার দিকে।

এখানে উপত্যকার প্রস্থ বড়জোর বিশ গজ, দু-ধারে খাড়া দেওয়াল। কায়দা জানা থাকলে পায়ে হেঁটে একজন মানুষের পক্ষে ওঠা সম্ভব; কিন্তু কোনো ঘোড়া দু-ফুটও যেতে পারবে কি না সন্দেহ। পুবদিকে, ক্যানিয়নের দেওয়ালে শেষ-সূর্যের আলো সামান্য ফুটে আছে এখনও।

প্রায় দেড়শো গজ যাবার পর চওড়া হয়ে গেল উপত্যকাটা। দৈর্ঘ্যে-প্রস্থে মাইল তিনেক হবে। ঝরনা আছে একটা, পথে যেটার পাশ কাটিয়ে এসেছি, তার সাথে এর যোগ আছে।

সচরাচর পাহাড়ি এলাকায় যেমন থাকে, তেমনি চমৎকার ঘেসো জমি। ঝরনার কিনারে সার সার অ্যাসপেন, গুটিকতক বামনাকৃতি উইলোও রয়েছে। কয়েকটা হরিণ চরছে অদূরে। মানুষের সাড়া পেয়ে তাকাল। আমার মনে হলো, এখানে আসার অন্য কোনো পথ আছে, তবে সেটা ঠিক কোথায়, ধরতে পারলাম না। আমি এগিয়ে যেতেই টুক করে পালিয়ে গেল হরিণগুলো।

পেছনের দড়িতে টান পড়ছে, আর এগোতে চাইছে না আমার প্যাক হর্স। বেশ ঠান্ডা হাওয়া, তবু ঘামছি আমি। মন খুঁতখুঁত করছে। স্ক্যাবার্ড থেকে উইনচেস্টার তুলে নিলাম।

রাশ আলগা করে চলার নির্দেশ দিলাম অ্যাপাসাকে। সন্তর্পণে, হিসাব কষে পা ফেলছে ও। ময়াল সাপের মত এখানকার সবকিছু টানছে আমাকে। ছায়ার দীর্ঘ থাবা আরও প্রসারিত হয়েছে, পাহাড়ের মাথায় ম্লান আলোয় দূরের আকাশকে দেখাচ্ছে খুব কাছের।

এবার গুহাটা চোখে পড়ল আমার।

আসলে ঝড়-বাদলে পাথুরে দেওয়াল ক্ষয়ে ওই গর্তের সৃষ্টি। তবু, কম করে হলেও আট-দশ ফুট গভীর। সামনে ঝোপঝাড়, বেশিরভাগ অ্যাসপেন, প্রবেশমুখ ঢেকে রেখেছে।

নেমে একটা গাছের সাথে ঘোড়া দুটো বাঁধলাম আমি। পায়ে হেঁটেই যাব, ঝুঁকি নেওয়া উচিত হবে না। কোনো ট্র্যাক নেই, দীর্ঘকাল কেউ মাড়ায়নি এ পথ। সাধারণত পাহাড়ি কেবিন যেমন হয়, এটাও তেমনি। পাথর সাজিয়ে দেওয়াল তোলা হয়েছে। ভেতরটা আগুনের ধোঁয়ায় কালো। বুঝলাম ওগুলো বহুদিনের পুরোনো দাগ।

একদিকের দেওয়াল ধসা, ইতস্তত ছড়ানো পাথর। শেষ প্রান্তে একটা গাছের গুঁড়ি পড়ে আছে। মসৃণ, কুঠার দিয়ে কেটে ফেলা হয়েছে।

বসার জন্যে ব্যবহৃত হত গুঁড়িটা, অনুমান করলাম। উলটোদিকে খাঁজ কাটা, কয়েক সারি। গুনে দেখলাম মোট একত্রিশটা সারি। দিনে একটা করে হলে অতগুলো খাঁজ কাটতে পাঁচ মাস লাগবে। এমন বিরান দেশে সময়টা একেবারে কম নয়।

গুহার মেঝেতে বালুর স্তর। হোঁচট খেলাম একটা কিছুর সাথে। সামান্য হাতড়াতে একটা মরচে পড়া বর্ম বেরিয়ে পড়ল। এককালে স্প্যানিশ যোদ্ধারা ব্যবহার করত এ ধরনের বর্ম।

স্প্যানিশদের সম্পর্কে আমার যা জ্ঞান, তার প্রায় সবটাই বাবার কাছে জেনেছি। মাঝেমধ্যে বাবা তাঁর যৌবনের কাহিনি শোনাতেন আমাদের। আমরা সান্তা ফের গল্প শুনেছি। বাবা কিছুদিন ছিলেন ওখানে। সান্তা ফে আবিষ্কৃত হবার বছর দশেক পর স্প্যানিশ ধর্মযাজকেরা প্লিমা উথরকে অবতরণ করেছিল।

খনিজ পদার্থের লোভে বহু জায়গায় অনুসন্ধান চালিয়েছিল ওরা। আজ আর সেসবের নথিপত্র নেই। এটাও হয়তো তেমনি একটা কিছু হবে।

যে ট্রেইল ধরে মোরায় যাচ্ছিলাম আমি, ছেলেবেলায় সেটার কথাও শুনেছি বাবার মুখে। মনট্যানার খনিশ্রমিকদের কাছে পরে আরও জেনেছি এ ব্যাপারে। ওই পথে উতেদের সঙ্গে স্প্যানিশরা ব্যবসা-বাণিজ্য করত। ফাদার এসকালেনতে, এমনকি ক্যাপটেন জন স্মিথ যখন ভার্জিনিয়া উপকূল আবিষ্কার করেন, তারও বহু আগে থেকে ওই ট্রেইল ধরে উত্তরে গেছে বণিকেরা। কিন্তু তারা বিশেষ রেকর্ড রেখে যায়নি। সতেরোশো পঁয়ষট্টি সালে রিভেরা এসেছিলেন এদিকে, অবশ্যি তত দিনে এই অঞ্চলের খবর সবাই জেনে গিয়েছিল। গুহা থেকে বেরিয়ে আবার উপত্যকার ওপরে উঠতে লাগলাম আমি। ঘোড়াগুলো সঙ্গেই আছে। আধমাইল যাবার পর পাহাড়ের ঢালে একটা সুড়ঙ্গ দেখতে পেলাম। আশপাশে পাথর ছড়ানো।

সুড়ঙ্গের দেওয়াল ঘেঁষে পাথরের পাঁজা। একটা তুলে নিলাম হাতে। বেশ ওজন। ঠুকে ঠুকে মাটি ঝেড়ে ফেলতেই চকচক করে উঠল সোনা।

প্রথমে বিস্ময়ে, তারপর আনন্দে আর উত্তেজনায় শিউরে উঠলাম আমি। এগুলো এখন আমার, অথচ মাত্র কদিন আগেও আমি ছিলাম নিঃসম্বল।

তিন

সোনার পাঁজা হাতে নিয়ে স্থাণুর মত দাঁড়িয়ে রইলাম। এই জনমানবশূন্য প্রান্তরে এমন ঘটনা ঘটবে আমি স্বপ্নেও ভাবিনি।

আমরা বিত্তশালী নই। মূলত আমাদের চাহিদা জমি। আবাদি জমি। পারিবারিক বন্ধনকে আমরা খুবই মূল্য দিই। আপদে-বিপদে একসঙ্গে রুখে দাঁড়াই সবাই।

হিগিনসদের সাথে আমাদের দীর্ঘকাল লড়াই চলেছে। এতে আমাদের অনেকেই মারা গেছে। হিগিনস পরিবারের শেষ সদস্য লং হিগিনসের মৃত্যুতে অবসান ঘটেছে এই শত্রুতার। ওকে মেরেছে আমার ছোট ভাই, ও'নীল ওসমান। আমি তখন

বাড়িতে ছিলাম না।

তবে এ মুহূর্তে আমার মাথায় অন্য চিন্তা চলছে। যেকোনো কাজের আগে চিন্তাভাবনা করবার পরামর্শ দিতেন বাবা। এখন আমি তাই করছি।

ভবিষ্যতে কী ঘটতে পারে, সে ব্যাপারে পরিষ্কার ধারণা থাকা দরকার। আগে খনিতে আমার মালিকানা প্রতিষ্ঠিত করতে হবে, তারপর সোনার খবর জানাব লোককে।

সোনার আরেক নাম বিপদ। অনেকেই এর স্বপ্ন দেখে; কিন্তু যখন পায়, নিজের অজান্তেই বিপদে জড়িয়ে পড়ে। সোনা মানুষের স্বাভাবিক মনুষ্যত্ববোধ নষ্ট করে। লোভে উন্মত্ত হয়ে ওঠে সে, খুন করতেও দ্বিধা করে না। কাজেই, সাবধান থাকতে হবে আমায়। এখন আমি এমন এক জায়গায় আছি, যেখানে আইনের শাসন বলতে কিছু নেই।

সোনা ভারী জিনিস। ইচ্ছে করলেই লুকিয়ে রাখা যায় না। এর যেন দুর্গন্ধ আছে, বাতাসে ছড়ায়।

তা ছাড়া, খনি থেকে বের করবার ঝক্কি প্রচুর। আমার সাথে সরঞ্জামাদি নেই। ঠিক করলাম, অল্প কিছু সোনা সঙ্গে নিয়ে যাব। ওগুলো বিক্রি করে সরঞ্জামাদি কিনব। আমার স্যাডলব্যাগেই নেব। ঝুঁকি আছে, কিন্তু আমি নিরুপায়। ক্যাটল ড্রাইভে সামান্য যা আয় হয়েছিল, খাবার এবং টুকিটাকি জিনিস কিনতে খরচ হয়ে গেছে।

ওই খনিতে আমার চাহিদার তুলনায় অনেক বেশি সোনা আছে। ছোটখাটো একটা বাথান আর কিছু বই কেনার সামর্থ্য

হলেই আমি খুশি। অশিক্ষা একটা অভিশাপের মত। পাহাড়ে সুযোগ-সুবিধার অভাবে আমার লেখাপড়া হয়ে ওঠেনি। কেবল কোনোমতে নিজের নাম সই করতে পারি। তাও বাড়িতে এক বাবা আর ও'নীল ছাড়া কারও সাধ্য ছিল না সেটা পড়ে। সেনাবাহিনীতে আমার অফিসারদের ভেতরে মাত্র একজন এক-আধটু বুঝতেন। এ নিয়ে আমাকে দুশ্চিন্তা করতে মানা করেছিলেন তিনি।

'রাইফেলে তোমার যা টিপ,' অফিসারটি বলেছিলেন, 'তাতে তোমার হাতের লেখা যত খারাপই হোক, কেউ কোনো প্রশ্ন করার সাহস পাবে না।'

কিন্তু আমি নিজেকে প্রবোধ দিতে পারি না। আমার ভাবী-বংশধরদের কাছে মুখ দেখাব কী করে? তারা যখন জানবে, তাদের বাবা মূর্খ, তখন কি শ্রদ্ধা থাকবে আমার প্রতি?

বীর্যবান পুরুষ বলে ওসমানদের খ্যাতি আছে। ভাই আর আত্মীয়স্বজন মিলিয়ে আমাদের পরিবারে পুরুষ মোট ঊনচল্লিশজন। বাবার দু'বোন-পাঁচ ভাই এখনও বেঁচে। দেশের নানা জায়গায় ছড়িয়ে আছে তারা। অনেকেই উচ্চশিক্ষিত। ওদের সামনে আমি নেহাত নগণ্য। তবে সোনা পাওয়ায়, আমার বিশ্বাস, এখন অবস্থার হেরফের ঘটবে।

শোবার আয়োজন করলাম। খসিয়ে নিলাম ঘোড়া দুটোর জিন। সুন্দর আবহাওয়া। বসন্তের মাঝামাঝি, গ্রীষ্ম সমাগতপ্রায়। পাহাড় থেকে বরফের দল বিদায় নিয়েছে, তবে মিলিয়ে যায়নি। এই রাজ্যে সেটা আশা করাও বোকামি, আবার

কখন শুরু হবে কেউ এ কথা বলতে পারে না আগাম।

শহর থেকে সরঞ্জামাদি নিয়ে তাড়াতাড়ি ফিরতে পারলে হয়তো কিছু সোনা উদ্ধার করে তুষারপাতের আগেই চলে যেতে পারব। এখন আমি যেখানে আছি, বছরের নয় মাস সেখানে বরফ থাকা বিচিত্র নয়। সুতরাং, এখানে আটকা পড়লে ভয়ংকর শীত পাড়ি দিতে হবে।

আরও একটা চিন্তা কাঁটার মত বিঁধছে আমার মাথায়।

বর্ষায় ওই গিরিপথ চলাচলের অনুপযোগী হয়ে পড়বে। ফলে, শীত-বর্ষা বাদ দিলে, হাতে থাকছে আর পঞ্চাশ-ষাট দিন। বড়জোর ওই ক'টা দিন এখানে ঢোকা বা এখান থেকে বেরোনো যাবে। অবশ্যি আর কোনো রাস্তা যদি থেকে থাকে, সেটা ভিন্ন কথা।

নিজেকে আমার ফাঁদে-পড়া ইঁদুরের মত মনে হচ্ছে। আগুনে কফির পাত্র চড়িয়ে পরিস্থিতি বিচার করতে বসলাম।

ওয়েস বিগলোর ভাইয়েরা হয়তো ভাবছে, আমি তাদের ফাঁকি দিয়েছি। সে ক্ষেত্রে ওরা পিছু নেবে। মোরার পথে নিজের ট্রেইল লুকোবার চেষ্টা করিনি। কথাটা মনে হতেই চমকে উঠলাম। বিগলোরা আমাকে খুঁজতে গিয়ে অ্যানজেল আর নীলের কাছে গিয়ে হাজির হোক, এটা আমি চাই না। এমনিতেই জাতি মামলায় আমাদের অনেক খেসারত দিতে হয়েছে। ওদেরকে বিপদে জড়াবার অধিকার আমার নেই।

তবে বিগলোরা এই উপত্যকায় আসবে বলে মনে হয় না। ভূতুড়ে ট্রেইলে ওঠার পর থেকেই নিজের ট্র্যাক ঢাকার

ব্যাপারে সচেষ্ট হয়েছি আমি।

দমকা বাতাসে অগ্নিশিখা কাঁপছে। মেঝেতে ছায়া পড়েছে স্প্যানিশ বর্মটার। দেওয়ালে ঠেস দিয়ে রেখেছি ওটা। আচ্ছা, অশরীরী আত্মারা কি এরকম রাতেই দেখা দেয়?

কেন জানি না, কিন্তু আমার মন বলছে আড়াল থেকে সারাক্ষণ কেউ নজর রাখছে আমার ওপর। ঘোড়াগুলো ছটফট করছে। ঘুমোবার আগে ওদের ভেতরে এনে আগুনের কাছাকাছি বেঁধে রাখলাম। সময় বিশেষে, পাহারাদার হিসেবে ঘোড়ার জুড়ি নেই। তা ছাড়া এ মুহূর্তে এরাই আমার একমাত্র সহায়।

ভোরে ঝরনায় মাছ ধরতে গেলাম আমি। বড়শি ফেলে কয়েকটা ট্রাউট ধরলাম। নাস্তা সারলাম আগুনে সেঁকে।

একটা মোটা গাছের ডাল ভেঙে সেটার এক প্রান্ত চিরলাম। এবার ওই ফাঁকে একটা গোলাকার নুড়িপাথর বসিয়ে দিতেই তৈরি হয়ে গেল একটা চলনসই কুঠার। এরপর সুড়ঙ্গের শেষ মাথায় গিয়ে কাজে হাত দিলাম। সন্ধে নাগাদ একটা বিরাট আকরিক খসে এল দেওয়াল থেকে। প্রায় তিনশো ভরি ওজন হবে।

এখন গভীর রাত, কিন্তু আমার বিশ্রাম নেই। সাবধানে স্ফটিকটা ভেঙে কিছু সোনা বের করলাম। উঁচুমানের জিনিস, জুয়েলারি দোকানে পাওয়া যায় এমনটা।

নির্জন পাইন-সুরভিত রাত। ফটফট শব্দে পুড়ছে লাকড়ি। হিমেল বাতাসে জুড়িয়ে যাচ্ছে শরীর। অন্ধকারে ঝরনার ঠান্ডা

পানিতে গোসল করলাম আমি, তারপর গুহায় ফিরে একটা ধনুক বানাতে বসলাম।

চেরোকী ইন্ডিয়ানদের মাঝে বড় হয়েছি আমরা, তির-ধনুকের সাহায্যে শিকার করতে জানি। অবশ্যি এ ছাড়া আমাদের কোনো উপায়ও ছিল না, পাহাড়ে গোলাবারুদের অভাব প্রচণ্ড।

সুন্দর গন্ধ ছড়িয়েছে ধোঁয়ার, থেকে থেকে সশব্দে লাকড়ি ফাটছে, তখন লকলক করে উঠছে শিখা। সহসা ঘোড়া দুটো পেছনের পায়ে ভর রেখে সোজা হলো। চট করে অন্ধকারে গা ঢাকা দিলাম আমি, হাতে উইনচেস্টার প্রস্তুত।

অনেকক্ষণ বসে রইলাম অনড়, কান সজাগ। ঘোড়াগুলোর শরীরে প্রতিফলিত হচ্ছে আগুন। বোধ হয় ভালুক কিংবা সিংহ-টিংহ হবে, অথচ ঘোড়ার আচরণ দেখে সেটা বিশ্বাস করতেও বাঁধছে।

খানিক বাদে ফের আহারে মন দিল দুই অ্যাপাসা। একটা কঞ্চির সাহায্যে কফির কেতলি কাছে টেনে নিলাম আমি, গরুর জার্কি মুখে পুরে চুষতে লাগলাম।

ভীষণ পরিশ্রান্ত লাগছে, ভারী হয়ে আসছে দু'চোখের পাতা। বৃষ্টির শব্দে ঘুম ভাঙল আমার। পুব আকাশে ভোরের পাণ্ডুর আলো ফুটেছে। অ্যাসপেন শাখায় বৃষ্টি পড়ছে ঝুপ ঝুপ ঝুপ... আতঙ্কে কাঁটা দিল আমার গায়ে—ওই গিরিপথ পানিতে তলিয়ে গেলে হপ্তাখানেকের ভেতর বেরোতে পারব না এখান থেকে।

মালপত্র গোছাতে শুরু করলাম তাড়াতাড়ি। আবার রওনা